ইস্‌লাম ও সুনীতিকুমার

সেখ সাবির হোসেন

অনুচিন্তন

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭) ভারতীয় ভাষাচর্চায় ও সংস্কৃতি চর্চায় একজন স্মরণীয় মণীষী। পণ্ডিত, রসিক ও মুক্ত মনের অধিকারী ছিলেন তিনি। বিশ্ব মানব চিন্তাই ছিল তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই তাঁর চোখে ভারতীয় সংস্কৃতি শুধু আর্য নয়, বহু বিভিন্ন উপাদানে গঠিত। তার কোনোটিই উপেক্ষা করা যায় না। শ্রদ্ধার দৃষ্টি একমাত্র যথার্থ দৃষ্টি — এ বোধ তাঁকে অনুপ্রেরিত করত এ ধরনের আলোচনায়। হিন্দু ধর্মের পাশাপাশি ইস্‌লাম ধর্মের প্রভূত প্রসঙ্গ এনেছেন তিনি লেখায়। সে লেখায় ইস্‌লামী শব্দ সম্পর্কে তিনি যেমন বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন, তেমনই আবার ইস্‌লামের উদার সংস্কৃতির কথা বলতে গিয়ে চরম প্রশংসা করেছেন। ব্যক্তিগত দ্বিধা-সংশয়-স্ববিরোধ সত্ত্বেও ভাষা চর্চার পরিসরে এই বহুত্ববাদী দর্শনেরই পরিচর্যা করেছেন সুনীতিকুমার। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধে সুনীতিকুমারের সেই দিকটির প্রতি আলোকপাত করা হবে। তাঁর মুক্ত চিন্তা ও ভারতবর্ষের ইতিহাস বোধ সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারনা অসাম্প্রদায়িক মনোভাব গড়ে তুলেছিল। ইস্‌লামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোচনায় ও বিশ্লেষণে তিনি সর্বতোভাবে এই মনোভাবেরই পরিচয় রেখেছেন। তাই বর্তমানে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যেও সুনীতিচর্চা আমাদের সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে।

মূল শব্দ : *ইস্‌লাম, সুনীতিকুমার, সংস্কৃতি, দর্শন।*

"...গর্বমুক্তমন
মূর্খতম পার্শ্বিকেরে গ্রীক কোটেশান
নিঃসঙ্কোচে বলে যান
সুরসিক, সুহৃদয়, বুদ্ধিক্ষুরধার –
সুবিখ্যাত অধ্যাপক সুনীতিকুমার।"[১]

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০ - ১৯৭৭) এর জন্মের ১২৫ বছর পার হয়ে গেলেও তাঁর খ্যাতি আজও অম্লান পাঠক সমাজে। তাঁর মেধা ও পান্ডিত্যের বহুমাত্রিক পরিচয় দিতে গিয়ে কেউ তাঁকে বলেছেন 'চলমান বিশ্বকোষ', কেউ আবার বলেছেন 'বর্তমান কালের পাণিনি' বা কারো প্রশংসায় 'বিশ্ব সংস্কৃতির তীর্থ পথিক', 'প্রজ্ঞাসুন্দর' ইত্যাদি। সুতরাং এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, এই মানুষটি ছিলেন পন্ডিত, রসিক ও মুক্তমনের অধিকারী।

অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

সুনীতিকুমার জন্মেছিলেন কেরানির সন্তান হয়ে নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরে।[২] দারিদ্র্য ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। তবে অন্তরে ছিল অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্যের সম্ভার। বিদ্যায় বুদ্ধিতে সহপাঠীদের সকলের শীর্ষে ছিল তাঁর স্থান। স্কুলের পড়ার সময়েই তাঁর বিবেকানন্দ চর্চা শুরু হয়। যে চর্চা চলেছিল তাঁর আজীবন। শুধু তাই নয়, তাঁর জীবনবোধ গড়ে উঠেছিল বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও ওয়াই.এম.সি.এ-র ভাবধারায়। প্রখ্যাত সমালোচক সুকুমারী ভট্টাচার্য জানান:

> "...কৈশোরেই দেশ সম্বন্ধে গর্ববোধ, কর্মনিষ্ঠা ও আত্মসংস্কৃতির নির্দেশ পান বিবেকানন্দের বাণীতে, উদার সংস্কারমুক্ত প্রীতিনিষ্ঠ জীবনদর্শন লাভ করেন ওয়াই.এম.সি.এ-র সংস্পর্শে এসে; অন্তরের গভীরতম আবেগের উন্মোচন ঘটে রবীন্দ্রকাব্যের ধারায় অবগাহন করে; দৃশ্যজগতের রসোত্তীর্ণ মহিমা তাঁর সামনে রূপায়িত হয় অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলার প্রভাবে। কৈশোরে লব্ধ এ ক'টি ঐশ্বর্যের উত্তরোত্তর বিকাশ ঘটতে থাকে পরবর্তী জীবনে-মনন, সংস্কারমোচন, সাহিত্যরস ও রূপোলব্ধিতে।"[৩]

কুলীন ব্রাহ্মণ হয়েও সংস্কারমুক্ত মন ছিল তাঁর। তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন তা ধরে রাখতেন আজীবন। প্রয়োজন হলে তার জন্যে সংগ্রামেও পশ্চাৎপদ হতেন না। এ সাহস কলকাতা দেখেছিল ৮৬ বছরের বৃদ্ধের মধ্যে রামায়ণ বিতর্ক সভায় (১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬)। সেখানে যুক্তি দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছিলেন রাম ও সীতা আদতে ভাই বোন। এবং রাম কোনো অবতার নন। এর জন্য সনাতনপন্থীদের কাছ থেকে তাঁকে কদর্যভাষায় অনেক গালাগালি শুনতে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও মত প্রত্যাহার করেননি। কারণ, জাতপাতকে তিনি অতটা পাত্তা দিতেন না। তিনি বলেন:

> "ও ঘরে (ঠাকুর ঘর) গেলে উনি (স্ত্রী) খুশি হন, যাই, কিন্তু পড়ি গীতা উপনিষদের সঙ্গেই বাইবেল, কোরান, হোমার, গ্রিকনাটক থেকে বিশেষ বিশেষ অংশ, রামায়ণ-মহাভারত-রবীন্দ্রনাথ; যে কোনো সৎসাহিত্য যা মনকে টেনে তোলে দৈনন্দিনতার ঊর্ধ্বে, সর্বমানবের সঙ্গে একাসনে বসায় তা-ই আমার ধর্মগ্রন্থ।"[৪]

বিশ্বমানব চিন্তাই ছিল তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য। মানবিক কোনো কিছুই তাঁর সাধনার বাইরে নয়। তাঁর চোখে ভারতীয় সংস্কৃতি শুধু আর্য নয়, বহু বিভিন্ন উপাদানে গঠিত; তার কোনোটিই উপেক্ষা করা যায় না। শ্রদ্ধার দৃষ্টি একমাত্র যথার্থ দৃষ্টি - এ বোধ তাঁকে অনুপ্রেরিত করত এ ধরনের আলোচনায়। হিন্দু ধর্মের পাশাপাশি ইস্‌লাম ধর্মের প্রভূত প্রসঙ্গ এনেছেন তিনি লেখায়। সে লেখায় ইস্‌লামি শব্দ সম্পর্কে তিনি যেমন বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তেমনি আবার ইস্‌লামের উদার সংস্কৃতির কথা বলতে গিয়ে চরম প্রশংসা করেছেন। আমাদের আলোচনায় ইস্‌লামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সুনীতিকুমারের দৃষ্টিভঙ্গিই আলোচ্য।

মধ্যযুগে তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠার উত্তরকালে এ দেশীয় আঞ্চলিক ভাষা বাংলা মর্যাদা পেতে শুরু করে। বিধর্মী বিভাষী এই রাজশক্তি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রসাদধন্য সংস্কৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষকতার চেয়ে এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর

মৌখিক ভাষা বাংলাকে ব্যবহারিক ও প্রশাসনিক কাজে আরবি ফার্সীর পাশে জায়গা দেয়। ফলে প্রচুর পরিমাণে আরবি ফার্সী ও তুর্কী শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারকে ঋদ্ধ করে।

প্রায় ৬০০ বছর এই শাসনের ছত্রছায়ায় গোটা মধ্যযুগ জুড়ে যে বাংলা ভাষা চর্চিত হয় মঙ্গলকাব্যে, জীবনীসাহিত্যে, লোকগানে ও গীতিকায় এমনকি অনুবাদ সাহিত্যে, দেখা যায় সেখানে আরবি-ফার্সী শব্দ বহুল পরিমাণে সম্পৃক্ত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই যার বাংলা প্রতিশব্দ নেই।

১৭৫৭-র পর নতুন ইংরেজ শক্তির আগমনের ফলে বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির সমাজ ও রাজনীতিতে যে প্রবল পরিবর্তন ঘটে তার ফলশ্রুতিতে শুরু হয় নতুন যুগের সাহিত্যচর্চা। এতদিন ব্যবহৃত মৌখিক গদ্য ব্যবহারিক জীবন থেকে উঠে আসে সাহিত্যের পাতায়। প্রশাসনিক কাজ এবং ধর্মপ্রচারের উদ্দ্যেশ্যে যথাক্রমে বিদেশীরা বাংলা গদ্যের যে চর্চা শুরু করে তাতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে এতদিন ব্যবহৃত ও প্রায় সম্পৃক্ত যে সব আরবি ফার্সী শব্দ বাংলা ভাষায় ছিল তার বর্জনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যাবে। হ্যালহ্যাড তাঁর ব্যাকরণের ভূমিকায় লিখবেন:

> "The following work [A Grammar of the Bengal Language] presents the Bengali language merely as derived from its parent Sanskrit. In the Course of my design I have avoided, with some care the admission of such words as are not natives of the country, and for that reason have selected all my instances from the most authentic and ancient composition."[৫]

অর্থাৎ, আরবি-ফার্সী শব্দ সহ সমস্ত অশুদ্ধি বাদ দিয়ে সংস্কৃতের সন্তান হিসেবে বাংলার আদর্শ রূপটিকে নির্মাণ করতে চান হ্যালহেড। এই প্রত্যয় বৈয়াকরণ উইলিয়াম কেরি পোষণ করেন।[৬] ভাষা রাজনীতির এই পটেই পা রাখেন তরুণ সুনীতিকুমার। তিনি এই ব্যাপারটি মেনে নিতে পারেননি। কারণ, তিনি মনে করতেন একাধিক ভাষার সমন্বয়েই একটি সমৃদ্ধ শব্দভান্ডার গড়ে উঠতে পারে। তাছাড়া ভাষার ভিতর দিয়ে মানব গোষ্ঠীর বিকাশ ঘটবে, সমৃদ্ধি ঘটবে-একথা তিনি একান্তভাবে বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি ইসলামি শব্দ সমূহকে অস্বীকার করেন নি। সাদরে কাছে টেনে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, গভীর আগ্রহে তিনি তাঁর লেখালেখিতে আরবি-ফার্সী শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। যেমন-'সংস্কৃতি' প্রবন্ধে সম্রাট আকবরের উদারচেতার পরিচয় দিতে গিয়ে 'সুলহ-ই-কুল্ল্' শব্দটির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। আবার ঐ প্রবন্ধেই 'সভ্যতা' শব্দের বিবর্তন প্রসঙ্গে 'তমদ্দুন' শব্দের প্রয়োগ করেছেন। বলেছেন :

> "আরবদের মধ্যেও শহরের সঙ্গে সভ্যতার অচ্ছেদ্য বন্ধন স্বীকার করা হয়; তাই যা 'মদীণা' অর্থাৎ নগরের সঙ্গে সংযুক্ত, তাই-ই হচ্ছে 'তমদ্দুন' বা সভ্যতা।"[৭]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'মদীণা' শব্দটিও আরবি ভাষা থেকে উদ্ভুত। মানবগণের সংগমন বোঝাতে আবার 'অন্‌জুমন' শব্দের উল্লেখ রয়েছে 'সংস্কৃতি' প্রবন্ধে:

> "সভা থেকেই অর্থাৎ মানবগণের সংগমন বা 'অন্‌জুমন' থেকে, একত্রীভবন থেকে, যা উঠেছে, তাকেই আমরা সভ্যতা বলি।"[৮]

এভাবে একাধিক শব্দের উল্লেখ ও অনুষঙ্গ আমরা দেখি তাঁর রচনায়। যেখানে ভাষাতাত্ত্বিকের মতো ইস্‌লামী শব্দ ব্যবহারে ঐতিহাসিক নিষ্ঠা নিয়ে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। আবার বাংলা শব্দভাণ্ডারে আরবি ফার্সী শব্দের প্রয়োগের সংখ্যা কত হতে পারে তার পরিসংখ্যানও দিয়েছেন। বলেছেন:

> "বাংলায় আগত প্রায় আড়াই হাজার ফারসী ও আরবী-ফারসী শব্দ অহরহঃ গৃহীত হচ্ছে। ... এরই মধ্যে বাংলা শব্দ হয়ে বাংলা ভাষায় এক রকম স্থায়ী আসন করে নিয়েছে।"[৯]

যাই হোক, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনব্যাপী বাংলা ভাষার এক মিশ্র চারিত্র্যের ছবি আঁকেন সুনীতিকুমার। যে ভাষা সংস্কৃতের কাছে ঋণী কিন্তু সংস্কৃতের দ্বারা আচ্ছন্ন নয়; বরং নানা জাতের ভাষার ঋণ ও সাহচর্যে নির্মীয়মান - যুগপৎ যার ভিত্তি বাংলাদেশের বহুত্ববাদী সংস্কৃতি। ব্যক্তিগত দ্বিধা-সংশয়-স্ববিরোধ সত্ত্বেও ভাষাচর্চার পরিসরে এই বহুত্ববাদী দর্শনেরই পরিচর্যা করেছেন সুনীতিকুমার। আজকে বহুত্ববাদের বিপন্নতার মুহূর্তে সুনীতিকুমারের ভাষাভাবনা তাই ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক।

ইস্‌লামী শব্দ নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি ইস্‌লামী সংস্কৃতি নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। যেখানে বিশ্বসংস্কৃতির তীর্থ পথিক সুনীতিকুমারের পরিচয় ব্যাপৃত আছে। ভারতীয় সংস্কৃতির কথা বলতে গিয়ে সুনীতিকুমারের বক্তব্য:

> "নবীন যুগের এই মিশ্র ভারতীয় সংস্কৃতি - যা বিশুদ্ধ হিন্দুও নয়, বিশুদ্ধ আরব জাত ইস্‌লামও নয়, যা হচ্ছে সত্যকার ভারতীয় হিন্দু-ইস্‌লামীয় সংস্কৃতি...।"[১০]

সুতরাং, সুনীতিকুমারের মতে ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে হিন্দু ও ইস্‌লামীয় মিশ্র সংস্কৃতির কথা বোঝানো হয়েছে। ইস্‌লামীয় সংস্কৃতি প্রসঙ্গে তিনি সুফী ভাবধারার উল্লেখ করেছেন। বলেছেন:

> "মধ্যযুগের ভারতের ধর্ম সাধনায় খুব বেশি করে ঈরানের সূফী মতবাদের, সূফী সংঘবদ্ধ সাধনার প্রভাব এসে পড়েছিল – এমনকি বাঙলার চৈতন্যোত্তর গৌড়ীয় মতের বৈষ্ণব সাধনার উপরেও। ঈরানী সূফী আধ্যাত্মিক সংগীতের ছায়া বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যেও পাওয়া যায়, বৈষ্ণব উদ্দাম কীর্তনের সঙ্গে সূফীদের নামের জিকির বা সমবেতভাবে উচ্চৈঃস্বরে নাম জপের মিল আছে; এইরূপ কীর্তনে যদি কোনও ভক্তের ভাবাবেশ হয়, বাঙলাতে তাকে বলা হয় 'দশা'। এই 'দশা' শব্দ এই বিশেষ অর্থে প্রাচীন সংস্কৃতে পাওয়া যায় না, কারণ এই ধরনের সমবেতভাবে গান গেয়ে ধর্মসাধনার রেওয়াজ বা রীতি প্রাচীন যুগে ছিল না বলেই মনে হয়। এখন, ফারসীতে সূফীদের পারিভাষিক শব্দে এইরূপ ভাবাবেশকে 'হাল' বলা হয় – 'হাল' মূলে আরবী শব্দ, এর

> মুখ্য অর্থ হচ্ছে 'অবস্থা', পরে 'ভাবাবেশ' অর্থে ফারসীতে এর অর্থ বিস্তার ঘটে। বাঙলায় 'দশা' শব্দটিরও এই বিশেষ অর্থে প্রয়োগ, ফারসী 'হাল' এরই দেখাদেখি হয়েছিল বলে মনে হয়। যাঁদের হাতে, যাঁদের দার্শনিক বিচার আর পান্ডিত্যের ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁদের মধ্যে শ্রীরূপ আর শ্রীসনাতন যে ফারসী ভাষা ও সাহিত্যেও প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন, সেকথা মনে রাখতে হবে। আর স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেবেরও যে মুসলমান শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ছিল, একথা 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' থেকে জানতে পারা যায়।"[১১]

সুনীতিকুমার এভাবে ইস্‌লামীয় সূফী সংস্কৃতির কথা বলতে গিয়ে শব্দেরও নিগূঢ় আলোচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, ইস্‌লামীয় সূফী সংস্কৃতির ভারতে আগমনের ফলে যে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রাণ ফিরে পেল, সম্পূর্ণতা পেল - সেকথাও তিনি অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন:

> "ভারতীয় সভ্যতা আর সংস্কৃতি তার বিশিষ্ট রূপ পাবার পরে, এদেশে ইস্‌লামীয় সংস্কৃতির আবির্ভাব হল। এই সংস্কৃতির মধ্যে যা সনাতন আর বিশ্বমানবের গ্রহণযোগ্য, সেটা হচ্ছে এর অন্তর্গত সূফী দৃষ্টিকোণ, সূফী আধ্যাত্মিক অনুভূতি। এই জিনিসকে মধ্যযুগের ভারত সাদরে বরণ করে নিলে, এর মধ্যে সে অচেনাকে খুঁজে পেল। কবীর, নানক, দাদূ প্রভৃতি সন্তগণের আবির্ভাব হল, ভারতে সূফী সাধকেরা এলেন; কাশ্মীরে জৈনুল আবেদীনের মতন উদার হৃদয় রাজার, সম্রাট আকবরের মতন 'সুল্‌হ্‌-ই-কুল্ল্‌' অর্থাৎ বিশ্বমৈত্রীর প্রচারকের, রাজকুমার দারা শিকোহের মতন হিন্দু আর মুসলমান চিন্তার ও সাধনার দুই মহাসাগরের মিলনাকাঙ্ক্ষী স্বপ্নদ্রষ্টার প্রকাশ ঘটল।"[১২]

আবার ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুনীতিকুমার ইস্‌লাম ধর্ম ও সংস্কৃতির আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন ভারতে ইস্‌লাম ধর্মের প্রতিষ্ঠার পরে দক্ষিণরায়ের পূজা ইস্‌লামী রঙে রঞ্জিত হয়ে গাজীমিয়াঁর নামে বাঙালী মুসলমান জনপদবর্গের মধ্যে বিদ্যমান আছে। আবার রামায়ণ মহাভারতে ও বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থে যে চৈত্য বা সমাধি পূজার উল্লেখ মেলে তা ইস্‌লাম ধর্মের ওপর প্রভাব ফেলেছে বলে তিনি মনে করেন:

> "চৈত্যপূজার অভিনব ইস্‌লামী রূপ দেখা দিল পীরের দরগা রূপে। ইস্‌লামের জন্মভূমি আরবদেশে অনুরূপ জিনিস নাই-যদিও ইস্‌লামের মধ্যে 'জাহিলিয়া' অর্থাৎ মোহম্মদের পূর্বেকার 'অজ্ঞতা'র যুগের অনেক ধর্মাচার ও অনুষ্ঠান ইস্‌লামের মধ্যে স্থান করিয়া লইয়া সমগ্র জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা বিশুদ্ধ কোরানী বা মোহাম্মাদী ইস্‌লামের পক্ষপাতী, তাঁহারা দরগাকে আশ্রয় করিয়া ধর্মানুষ্ঠান পছন্দ করেন না, অনেকে এ সম্বন্ধে ঘৃণা প্রকাশ করেন এবং এইরূপ রীতিকে 'পীরপরস্তী',

> অর্থাৎ 'স্থবির পূজা' এবং 'গোর পরস্তী', অর্থাৎ 'সমাধিপূজা' বলিয়া অবজ্ঞা করেন; কিন্তু সারা বাঙ্গালা, সারা ভারত ও পূর্ব ঈরান জুড়িয়া পীরের দরগায় এবং মজারে মুসলমান (এবং মুসলমানদের দেখাদেখি হিন্দু) ভক্তবৃন্দ শীরনী দিয়া জোরের সঙ্গে পূজা করিতেছে; এই জিনিস বন্ধ করিতে যাওয়া মুসলমান সমাজে ধর্মীয় অন্যবিধ নেতারা নিরাপদ মনে করেন না।[১৩]

আবার ইস্‌লামের শ্রেণীবিভাজন সম্পর্কে সুনীতিকুমার বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন:

> "শরিয়তী ও সূফিয়ানা - এই দুই প্রকারের ইস্‌লামের মিলিত প্রভাব আসিয়া মুসলমান রাজশক্তির সহিত যোগ দিল এবং বহু হিন্দু ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করিল। বাঙালীর জীবনে ইহার ফলে আর একটি নূতন ভাবধারা আসিয়া মিলিত হইল - ইস্‌লামী ভাবধারা, বিশেষ করিয়া সূফী মতের ভাবধারা ও আদর্শ।"[১৪]

যাইহোক, সুনীতিকুমারের মুক্ত চিন্তা ও ভারতবর্ষের ইতিহাসবোধ সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারনা তাঁর অসাম্প্রদায়িক মনোভাব গড়ে তুলেছিল। ইস্‌লামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোচনায় ও বিশ্লেষণে তিনি সর্বতোভাবেই এই মনোভাবেরই পরিচয় রেখেছেন। তাই বর্তমানের সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যেও সুনীতি চর্চা আমাদের সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে।।

তথ্য উৎস

১. সুনীতিকুমারের মৃত্যুর পর 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় প্রকাশিত উদ্ধৃতির অংশবিশেষ।
২. ১৮৯০ সালের ২৬ নভেম্বর। পিতামহ কার্তিকচন্দ্র, পিতামহী যাদুমনি দেবী, মাতা কাত্যায়নী দেবী, পিতা হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, অগ্রজ অনাদিনাথ, পরে আরো দুই বোন ও দুই ভাই। পিতা হরিদাস চট্টোপাধ্যায় টার্নার মরিসন অ্যান্ড কোম্পানিতে একাদিক্রমে ৪০ বছর কেরানির কাজ করে অবসর নেন।
৩. ভট্টাচার্য, সুকুমারী / প্রবন্ধ সংগ্রহ-৩/ গাংচিল প্রকাশন/ মে, ২০১৩/পৃ.৩৮৬।
৪. উদ্ধৃতি সংগ্রহ। পূর্বোক্ত। পৃ.৪১৫
৫. Halden, N.B., Preface, A Grammer of the Bengal Language, Calcutta, Ananda Publishers Pvt. Ltd., 1980, P. xxi - xxi
৬. রায়, দেবেশ/ ও.ডি.বি.এল.: একটি নতুন পাঠোদ্ধারে প্রস্তাব/মেটেফুল/শারদ/১৪১৫/পৃ.৪৫
৭. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার/ সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস। জিজ্ঞাসা। জানুয়ারি ২০০৩। পৃ. ৯
৮. পূর্বোক্ত। পৃ.৯
৯. পূর্বোক্ত। পৃ.৪
১০. পূর্বোক্ত। পৃ.১২
১১. পূর্বোক্ত। পৃ.৩
১২. পূর্বোক্ত। পৃ.১২
১৩. পূর্বোক্ত। পৃ.২৮
১৪. পূর্বোক্ত। পৃ.৩১